**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1545-1555
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.376**

# ১৯৭১ পরবর্তী করিমপুরের উদ্বাস্তু কলোনির একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

**সৌভিক মন্ডল,** *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

**রমা প্রামানিক,** *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

In 1971, during the Bangladesh Liberation War, nearly 10 million refugees took shelter in India between early May and the end of June. The majority of these refugees stayed in West Bengal, with about 1.2 million settling in Nadia district. One of the border blocks of Nadia that witnessed this influx was Karimpur. In the decades following 1971, the large number of refugees who arrived and permanently settled in the Karimpur region gave rise to colonies. Some of these colonies include Sukanta Colony (1973), Upananda Colony (1977), Dinesh Colony (1984), Tarak Colony (1986), and Pramod Dasgupta Colony (1984). The residents of these colonies were uprooted people from East Pakistan, primarily from lower-caste Hindu communities such as Namashudras, Dhobis, Rajbanshi, and others. They had no wealth, education, or exposure to advanced culture. The colony dwellers often joined movements demanding food, clothing, housing, rehabilitation loans, education, and agricultural land, with leadership provided by members of the CPI(M) party. In the early years of refugee life, they were economically dependent, but over time they became self-reliant through farming, fish cultivation, handloom industries, and later even by working abroad. Their religious practices, language, food habits, and social customs differed from those of the locals. As a result, the blending of refugee culture with local traditions created a mixed culture in the Karimpur region. Today, the colony residents— Namashudra, Dhobi, Rajbanshi and other marginalized groups— have embraced the motto "work in hand, God's name on lips" and have successfully left their mark in fields such as economy, politics, and education.

**Keywords:** Agriculture, handloom, food-habits, social-customs, communities, Political party

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দ্বিজাতী তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত ও স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা ও তার বিভাজনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হাঙ্গামা ও অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটে। অসংখ্য ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক ঘটনার সাক্ষী হয়ে প্রথম পর্যায়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং পরবর্তী পর্যায়ে নিম্নবিত্ত বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদ্বাস্তু আগমনের ধারা নোয়াখালী দাঙ্গা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তু সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর আকার

ধারণ করে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের বসবাসকারী নিম্ন বর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর পাক হানাদার বাহিনীর অপহরণ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের এর মত ঘটনা ঘটতে থাকে। যার ফলে নিম্ন বর্ণের প্রধানত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষগুলো পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ সালে মে মাসের প্রথম দিক থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত সময়কালে প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। যার সিংহভাগই পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায় এবং নদিয়াতে আশ্রয় নেই প্রায় ১২ লক্ষ শরণার্থী। উদ্বাস্তুদের আগমন ও আশ্রয়ের ফলে সীমান্তবর্তী জেলা গুলি পূর্বের মতো (১৯৪৭ সাল) উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে অন্যতম জেলা হল নদিয়া ও তার সীমান্তবর্তী ব্লক গুলি। এমনই একটি ব্লক হল করিমপুর। করিমপুরে ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু আগমন ও বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কলোনি গড়ে ওঠে, এমনই কয়েকটি কলোনি হল সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি, উপানন্দ কলোনি, তারক কলোনি, প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি।

**সুকান্ত কলোনি:**

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ১৬ টি উদ্বাস্তু পরিবার করিমপুরের সেনপাড়া অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তবে সেখানে কিছুদিনের মধ্যে লুটপাট ও ডাকাতির ঘটনা ঘটলে এই পরিবারগুলো ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে রহমতপুর অঞ্চলে চলে আসে। রহমতপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক বছর বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে ১৯৭৩ সাল নাগাদ তারা রহমতপুর জি.এস কলোনি (১৯৪৭ সালে গড়ে ওঠে) ও আনন্দ নগর কলোনির (১৯৫৬ সালে গড়ে ওঠে) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। স্থায়ী বসতি স্থাপনের সময় তারা স্থানীয়দের বাধার সম্মুখীন হয়। তারা যে সরকারি জমিতে কলোনিটি গড়ে ওঠে সেই নিম্ন সমতলভূমি গুলো স্থানীয়রা আমন ধান চাষ, মৎস্য শিকার, পাট পচানো, পশু চরণ ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করত। ফলে এইসব স্থানে নতুন করে উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করা ছিল স্বাভাবিক। বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তারা পার্শ্ববর্তী নমঃশূদ্র কলোনির বাসিন্দা ও স্থানীয় সিপিআইএম পার্টির নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হন এবং তাদের সমর্থন লাভ করেন। রহমতপুর জি. এস কলোনি এবং আনন্দনগর কলোনির উদ্বাস্তু বাম নেতাদের সহায়তায় ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে কলোনিটি গড়ে ওঠে।

উদ্বাস্তু জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এই কলোনিটির নাম করণ করা হয় প্রয়াত স্থানীয় বামপন্থি নেতা সুকান্ত বিশ্বাসের নাম অনুসারে সুকান্ত কলোনি। মনমোহন সরকার, কেশবচন্দ্র বিশ্বাস, সমর মন্ডল, শিবশঙ্কর বিশ্বাস সহ অন্যান্য বামপন্থি নেতাদের সহায়তায় কলোনিটি গড়ে ওঠে। কলোনি গড়ে উঠলেও কলনিবাসীদের জীবনযাত্রার তেমন কোনো পরিবর্তন সে সময় লক্ষ্য করা যায়নি। নামে মাত্র যাযাবর জীবন থেকে তারা স্থায়ী বসতি পায়। শুরু হয় জীবন সংগ্রামের বেঁচে থাকার লড়াই। খাদ্য সংকট, নিম্ন জলাভূমির বর্ষার জলমগ্নতা, পোকামাকড়ের উপদ্রপ, ডেঙ্গি, কলেরা সব মিলিয়ে কলোনিবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গে তারা নিম্ন অর্থনীতির মানুষ হলেও এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন পূর্বে তারা হয়নি। কয়েক মাসের মধ্যে আরআর বিভাগের (Refugee Relief & Rehabilitation Department) সদস্যরা এসে মনমোহন সরকারের বাড়িতে প্রায় চার দিন থেকে সুকান্ত কলোনি পর্যবেক্ষণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে শিকারপুর বিডিও অফিসের প্রতিনিধিরাও এসে কলোনি পর্যবেক্ষণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে কলোনির পাট্টা প্রদান করেন। সরকারিভাবে কলোনিতে একটি টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। আরআর বিভাগের উদ্যোগে চাল, মাইলো, ত্রিপল কলোনি বাসীদের দেওয়া হয়। তবে পূর্বে গড়ে ওঠা কলোনিবাসীরা চাষের জমি, চাষের জন্য বলদ গরু, ডোল সহ যেরূপ  সরকারি সহায়তা পেয়েছিল তাদের তা দেওয়া হয়নি। সুকান্ত কলোনি গড়ে ওঠার সময় ১৬ টি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠলেও পরবর্তী কয়েক দশকে নতুন কয়েকটি পরিবার এই কলোনিতে

আশ্রয় নেয়। বর্তমান সময়ে প্রায় ৩৮০ টি পরিবার ও ১৭০০ থেকে ১৮০০ মানুষের বসবাস এই কলোনিতে। যদিও ১৯৭৫ ও ১৯৮২ সাল সহ পরবর্তী সময়ে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার কলোনিতে নতুন করে বসতি স্থাপন করে, আবার কিছু পরিবার পরবর্তী সময়েও হবিবপুর সহ অন্যান্য জায়গায় চলে যায়। বর্তমানে এই কলোনির ৮১ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ, ৬ শতাংশ মানুষ তাঁত শিল্প, ৯ শতাংশ বিদেশে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক, ৪ শতাংশ ব্যবসা, চাকুরি ও পরিবহন সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত।

**দীনেশ কলোনি:**

১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ পুনর্বাসন দপ্তরের সহায়তায় গড়ে ওঠা রহমতপুর জি.এস কলোনির বাসিন্দা উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস পুনর্বাসনের প্রাপ্ত জমি ও ঘরবাড়ি ছেড়ে ১৯৭৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশে চলে যান। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছেড়ে যাওয়া জমিগুলো কলোনির অন্যান্য বাসিন্দারা, প্রধানত বালা পরিবারের সদস্যরা নিজেদের দখলে নেন। এমতাবস্থায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ থেকে আগত বারোটি উদ্বাস্তু পরিবার আনন্দ নগর কলোনি (১৯৫৬ সালে গড়ে ওঠে) ও সুকান্ত কলোনি সহ বিভিন্ন স্থানে তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং তারা জনমজুর, রাখালী ও খাদ্যের বিনিময়ে শ্রমদান করে জীবন যাপন করতে থাকে। অর্ধ যাযাবরের মত নিজের স্থায়ী আশ্রয় ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের কাছে এই ১২ টি উদ্বাস্তু পরিবার প্রায় নয় বছর কাটিয়ে দেয় এভাবেই। ১৯৮৪ সাল নাগাদ স্থানীয় সিপিআইএম নেতা যতীন্দ্রনাথ মন্ডলের সহায়তায়, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছেড়ে যাওয়া জমি অর্থাৎ বালা পরিবারের দখলিকৃত জমিতে এই উদ্বাস্তু পরিবার গুলোর পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বালা পরিবারের অধীনস্থ জমিতে পুনর্বাসন কে কেন্দ্র করে বালাপরিবার ও যতীন গোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব খুব সহজেই রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে কারণ উভয় গোষ্ঠীর সদস্যরা ছিলেন রাজনৈতিকভাবে সিপিআইএম দলের সদস্য। এই দ্বন্দ্বের ফলে জি.এস কলোনি, আনন্দনগর কলোনি ও সুকান্ত কলোনি সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। পুলিশ প্রশাসন এক্ষেত্রে তেমন হস্তক্ষেপ করেননি। তবে অনেক বাধা বিপত্তি ও দ্বন্দ্বের সত্ত্বেও স্থানীয় উচ্চ নেতৃত্বের সমর্থনে রাজনৈতিকভাবে যতীন গোষ্ঠী অধিক ক্ষমতাশালী হওয়ায় ১৯৮৪ সালে ১২ টি উদ্বাস্তু পরিবারকে একটি রাত্রির মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

কলোনি স্থাপনের আগে বা পরে এই ছিন্নমূল মানুষগুলো সরকারের কাছে থেকে কোনরূপ সাহায্য পাইনি। তারা দেশান্তর হবার পর প্রায় ৯ বছর যাযাবরের মত আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে থেকে পুনর্বাসন ছাড়াই কাটিয়ে দেয়। এই সময় তাদের কাছে 'ত্রাতা' হয়ে আসেন উদ্বাস্তু বামপন্থী নেতা যতীন্দ্রনাথ মন্ডল। তিনি নিজ উদ্যোগে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও কলোনিবাসীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তবে স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ নিজেদের রাজনৈতিক সমর্থন লাভ ও নিজ গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পূর্বে এই কলোনিবাসী দের কাজে লাগিয়েছিলেন। কলোনিবাসীরা রাজনৈতিক আন্দোলন, মিটিং, মিছিল সব ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের কথায় অংশগ্রহণ করতেন। ফলপ্রসূত তারা প্রথম পর্বে ভোটের কার্ড, রেশন কার্ড ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা লাভ করেন। উদ্বাস্তু পরিবারগুলো নিজেদের উদ্যোগে মাটি, পাটকাঠি, টিন, টালি ও দরমার বেড়া দিয়ে মাথা গোজার আস্তানাটি গড়ে তোলেন।[১] ১৯৮৪ সালে গড়ে ওঠা কলোনিটির নামকরণ করা হয় প্রয়াত স্থানীয় সিপিআইএম নেতা দীনেশ মণ্ডলের নাম অনুসারে 'দীনেশ কলোনি'। আবার কলোনিটি 'হঠাৎ কলোনি' নামেও পরিচিত, কারণ দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের মধ্যে হঠাৎ করেই কলোনিটি গড়ে ওঠে। যতীন্দ্রনাথ মন্ডল এর নেতৃত্বে হঠাৎ এই গড়ে ওঠা কলোনি তাই 'হঠাৎ কলোনি' নামেও পরিচিত। বর্তমানে কলোনিটিতে প্রায় ৫০ টি পরিবার ও ২১০ জন মানুষের বসবাস। মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ, ১০ শতাংশ তাঁত শিল্প, ১১ শতাংশ বিদেশে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক, ৪ শতাংশ চাকুরী, পরিবহন সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত।

সুকান্ত কলোনি (১৯৭৩ সাল), দীনেশ কলোনি (১৯৮৪ সাল), আনন্দ নগর কলোনী (১৯৫৬ সাল) পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে কলোনি গুলোর সমস্যা ও সমাধান ছিল প্রায় একই। কলোনি গুলো স্থাপনের পর মূল সমস্যা লক্ষ্য করা যায় যাতাযাতের সমস্যা। নিম্ন ভূমি অঞ্চলে কলোনি গুলোর অবস্থান ও চতুর্দিকে খাল, বিল জলভূমি দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় বাইরের জগতের সঙ্গে কলোনির যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা সংযোগ অথবা পায়ে হাঁটা বাঁশের সাঁকো। এছাড়া কলোনি গুলোর অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য কোন প্রধান রাস্তা না থাকায় কলোনি বাসিরা একে অপরের বাড়ি, ধান খেতে, চাষ জমি সহ অন্যান্য স্থান দিয়ে যতায়াত করতো। উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি ও রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনমোহন সরকার ও কেশবচন্দ্র বিশ্বাসের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সভাপতি তথা ব্রিটিশ সময়ের মুহুরী হবিবুর রহমান ও পঞ্চায়েত প্রধান শংকর বিশ্বাসের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি সময়সময় ভূমি দপ্তরের ম্যাপ থেকে কলোনির মাঝ বরাবর একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হয় ম্যাপে। কলোনির অভ্যন্তর দিয়ে তৈরি ম্যাপের উক্ত রাস্তাটি তৎকালীন বিডিও অফিস শিকারপুরে জমা দিলে সেটি কলোনির প্রধান রাস্তা হিসেবে বৈধতা পায় এবং কলোনির অভ্যন্তরে মাটির রাস্তা গড়ে তোলা হয়। এই রাস্তাটিই প্রায় চারটি কলোনি ও পার্শ্ববর্তী গোয়াস গ্রামের প্রধান রাস্তা হিসেবে গড়ে ওঠে।

১৯৮৩ সালে বামফ্রন্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এলে উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি মনমোহন সরকার উপপ্রধান নির্বাচিত হন। এই পরিস্থিতিতে কলোনিবাসীদের স্বার্থে তিনি নানান জনকল্যাণকারী কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর উদ্যোগে কলোনির অভ্যন্তরে চলাচলে সুবিধা হলেও কলোনি থেকে বাইরে বেরোনোর মাধ্যম ছিল বাঁশের সাঁকো অথবা নৌকার মাধ্যমে। সাঁকো বছরের সব মরশুমে ব্যবহার করা ও ছিল দুষ্কর, যার কারণে কলোনিবাসীদের নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তাদের সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে মনমোহন সরকার বাসের সাঁকোটি সরিয়ে নিম্ন জলাভূমির মধ্যে দিয়ে মাটির বাঁধ নির্মাণ করে স্থায়ী রাস্তা নির্মাণে উদ্যোগী হন। পঞ্চায়েতের 'ফুড ফর ওয়ার্ক' কর্মসূচির শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণের কাজটি দ্রুত শুরু হয়। প্রথমদিকে এই কাজে বাধা হয়ে আসে নিম্ন জলভূমির কাদা। নিম্ন জলাভূমির কাদায় প্রায় ২০০ মিটার বাঁধ নির্মাণ করতে সময় লাগে দীর্ঘ চার মাস। বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণের ফলে কলোনির মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়।

আর্থ-সামাজিক সংকটে পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় প্রায় অর্ধ যায করেন নাই দেড় দশক কাটিয়ে ছিন্নমূল মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে তারা বিক্ষোভও আন্দোলনের দিকে ঝোঁকে। যদিও পূর্বে রাজনৈতিক দল গুলো নিজেদের স্বার্থে তাদের কাজে লাগিয়ে অসংখ্য বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল করেছিলেন। তাদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলো ধীরে ধীরে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার এবং নেতৃত্ব প্রদান করতে থাকে।[২] কলোনিবাসীরা খাদ্য, বস্ত্র, পুনর্বাসন ঋণ, শিক্ষা, প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারকে অন্তত ১০ কাঠা চাষযোগ্য জমি, শ্যালো-মেশিন প্রদান ও খাস, উদ্বৃত্ত, পয়স্তি জমি উদ্ধার, জোতদার ও মহাজনদের নামে-বেনামের অবৈধ জমি উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা সহ নানান দাবীতে তারা আন্দোলন শুরু করে।[৩] এই সময় অনেক কলোনিবাসী নকশাল আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অসচেতনতার কারণে তারা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে, তবে পরবর্তী সময়কালে এই ধারা বদলাতে থাকে।

সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি এবং আনন্দ নগর কলোনির ছিন্নমূল মানুষগুলোর সাহায্যের জন্য আনন্দ নগর কলোনিতে গড়ে ওঠে ফাইটিং ক্লাব। গৌরীশংকর সরকার, রঘুনাথ বিশ্বাস, স্বপন বিশ্বাস, আনন্দ বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সুধাংশু বালা সহ প্রমুখের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে ক্লাবটি গড়ে ওঠে। তবে ১৯৮৩ সালে ক্লাবটির রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অনির্বাণ ক্লাব'। ক্লাবটি গড়ে ওঠার সময়কাল থেকেই বাস্তহারা কলোনিবাসীদের সার্বিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ক্লাবের সদস্যরা। প্রথমদিকে

কলোনিবাসীকে চাল, ডাল, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলেও পরবর্তী সময়কালে দরিদ্র কলোনিবাসীর ছেলে মেয়ের বিবাহে আসবাবপত্র অনেক ক্ষেত্রে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। এছাড়া ক্লাবে সদস্যরা দরিদ্র উদ্বাস্তু কৃষকের জমির ফসল কেটে দেওয়া, মাড়াই করা সহ শস্য ঘরে তুলে দেবার মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯৭৭, ১৯৮৬ ও ২০০০ সালের বন্যার সময় ক্লাবের সদস্যরা উদ্ধার কাজ ও ত্রাণশিবির খোলার পাশাপাশি খাদ্য, ত্রিপল প্রভৃতি বিতরণ করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ক্লাবের উদ্যোগে কলোনি গুলোর মধ্যে খেলার টুর্নামেন্ট এবং রক্তদান শিবির, কুইজ প্রতিযোগিতা ও শংসাপত্র প্রদান সহ বিভিন্ন সমাজ সচেতন মূলক কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯০ এর দশকে ক্লাবের সদস্য তপন বিশ্বাস, কার্তিক সরকার, হরেণ সরকার, প্রভাস মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সহ প্রমুখের উদ্যোগে ক্লাবের পক্ষ থেকে কলোনি গুলোর ছাত্র ছাত্রীদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোন ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নিলেও তা ক্লাবের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। এভাবেই ক্লাবটি কলোনি গুলোর বিভিন্ন সামাজিক কাজের অংশীদার হয়ে ওঠে।[৪]

পুনর্বাসনের পর কলোনিবাসী দের কাছে একটি বড় সমস্যা ছিল জীবিকার সমস্যা। ইতিমধ্যে তাদের বাসস্থান গড়ে উঠলেও জীবনধারণের জন্য জীবিকা তাদের কাছে ছিল না। তাই এই সময় তারা স্থানীয়দের জমিতে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ রাখালী, মাছ ধরা, কলোনি সংলগ্ন নিম্ন জলাভূমিতে আমন ধান চাষ, ঘরামির কাজ, পশুপালন ছাড়াও বাড়ির মহিলারা পশুপালন, সুতো কাটা, বিড়ি তৈরির মতো বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।[৫] সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি, আনন্দ নগর কলোনি ও উপানন্দ কলোনির পাশে অবস্থিত বিলের উপর কলোনিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তবে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিলটি মালিকানাধীন করলে কলোনি বাসীরা প্রচন্ড আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে স্থানীয় নেতাদের স্লোগান ছিল 'জাল যার জল তার' অর্থাৎ জাল যার আছে জলে মাছ সে ধরবে। তবে ক্ষমতায় আসার পর সেই কথার পরিবর্তন হয়। বিলটিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন করায় কলোনি বাসীরা অর্থনৈতিকভাবে সমস্যা সম্মুখীন হয়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে বিকল্প অর্থনৈতিক পথ হিসেবে শান্তিপুর থেকে তাঁত শিল্পের আগমন ও বিকাশ ঘটায়। বিশ শতকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলোনিগুলোতে তাঁত শিল্পের ব্যাপক হারে প্রসার ঘটে। নারী পুরুষ উভয়েই তাঁত শিল্পে নিযুক্ত হয়ে পড়েন। চরকায় সুতো কাটা, কাপড় বোনা, সুতোয় রং করা, নকশা আঁকা সহ বিভিন্ন কাজে কলোনির মহিলারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কলোনি থেকে তাঁত শিল্পের মহাজনেও পরিণত হয়। যারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থানীয় মাহিষ্য, তিলি, সাহা সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তাঁত শিল্পের বিকাশ ঘটায়।

তাঁত শিল্পে মন্দার কারণে কলোনি বাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন না হওয়ায় পুরুষেরা দেশে-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজের উদ্দেশ্যে যেতে থাকে। তারা প্রথমদিকে চেন্নাই, দিল্লি, মুম্বাই, পুনে, কেরালা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজের উদ্দেশ্যে গেলেও পরবর্তী সময়ে অধিক উপার্জনের আশায় ভিসার মাধ্যমে সিঙ্গাপুর, দুবাই, কাতার, কুয়েত, ইতালি, মালয়েশিয়া, ইরান সহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেয়। ২০০০ সালের পরবর্তী সময় থেকেই কলোনিবাসীর অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কলোনি গুলোর মধ্যে থেকে প্রথম বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে ইরানে যাই সুভাষ বিশ্বাস। যিনি কলোনিবাসীদের কাছে 'সাদ্দাম' নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। এবং পরবর্তী সময়কালে সুকান্ত কলোনি (১৯৭৩ সাল), দীনেশ কলোনি (১৯৮৪ সাল), আনন্দ নগর কলোনি (১৯৫৬ সাল), রহমতপুর জি.এস কলোনি (১৯৪৭ সাল) র শত শত যুবক প্রবাসে কাজ করে কলোনি গুলির বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমান সময়ে কলোনি গুলির অর্থনীতির প্রায় ৪০ শতাংশ প্রবাসী অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। এবং এই বৈদেশিক অর্থ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অর্থনীতির ওপর সদর্থক প্রভাব ফেলছে।

জীবন জীবিকার লড়াই চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কলোনি বাসীরা তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানে উদ্যোগী হন। তাদের আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল সরকারি উদ্দ্যোগে শিক্ষাদান। তাই কলোনি বাসীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে মনমোহন সরকার করিমপুরের এম.এল.এ চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের সহায়তায় কলোনিতে একটি প্রাইমারি স্কুল গড়ে তোলেন। বর্ডার সংলগ্ন অঞ্চলে বরাদ্দকৃত স্কুলটি স্থাপনের যথাযথ কোন জায়গা না পাওয়ায়, স্কুলটিকে কলোনিতে স্থাপন করা হয়। কলোনির বাসিন্দারা চাঁদা তুলে স্কুল স্থাপনের জন্য জমি কেনেন এবং স্থানীয় ধনী ব্যক্তি মোহন বিশ্বাস ০.৫ শতক জমি দান করলে সুকান্ত কলোনিতে প্রায় সাড়ে তিনশতক জমিতে ১৯৮৩ সালে স্কুলটি গড়ে ওঠে। বর্তমানে এই স্কুলে প্রায় ১০০ জনের কাছাকাছি ছাত্র, ছাত্রী পঠন পাঠন করে।

ছিন্নমূল মানুষগুলোর কাছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল সংগ্রামের ও বিতাড়নের আতঙ্কে জর্জরিত। তাই তারা অনুভব করে যে রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকা তাদের কাছে অনেকটা সুবিধার ও সুরক্ষিত।[৬] কলোনি স্থাপনের প্রথম দিন থেকে কলোনি গুলোতে বামপন্থী দলগুলির প্রাধান্য ছিল ব্যাপক। ছিন্নমূল মানুষ গুলোর মধ্যে থেকে নির্বাচিত বাম প্রার্থী মনমোহন সরকার রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া কেশবচন্দ্র বিশ্বাস, যতীন্দ্রনাথ মন্ডল সহ প্রমুখেরা কলোনির বাম রাজনীতির প্রধান মুখ ছিলেন। কলোনি গুলো স্থাপনের প্রথম কয়েক দশক কলোনিতে কোন বিকল্প রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিলনা। কলোনি বাসীরা ছিল বামফ্রন্টের 'বন্দী ভোটার'।[৭] ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে কলোনি গুলোতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, হরিপদ বিশ্বাস, কার্তিকচন্দ্র সরকার সহ প্রমুখের হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রভাব বিস্তার ও কলোনিতে ক্ষমতা লাভ ঘটে। যে চিত্র ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যায় সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি, আনন্দ নগর কলোনি ও উপানন্দ কলোনিতে।

**উপানন্দ কলোনি:**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু পরিবার বিতাড়িত ও বাস্তুচ্যুতো হয়ে শরণার্থী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের উদয়নগর কলোনিতে বসতি স্থাপন করে। বসতি স্থাপনের কয়েক বছরের মধ্যেই সীমান্ত সংলগ্ন জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী এই কলোনিতে ভাঙ্গন দেখা দিলে কলোনিবাসীরা পুনঃরায় বাস্তুচ্যুতো হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় করিমপুর থানার রহমতপুর গ্রামের একটি পুরানো পরিত্যক্ত মসজিদে ১৯৭৪ সাল নাগাদ তারা বসবাস শুরু করে। ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তারা প্রায় তিন বছর মসজিদে বসবাস করে। এই তিন বছর তারা যাযাবরের মতো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় ধর্ম কে আঁকড়ে বেঁচে থাকে। এই সময় তারা জীবন ধারনের জন্য অন্যের জমিতে দিনমজুরি, রাখালি, পশুপালন, মৎস্য শিকার, খাদ্যের বিনিময়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে থাকে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলারা ছিল অত্যন্ত কর্মঠ প্রকৃতির, তারা কোন অংশেই পুরুষদের থেকে কম ছিল না পশুপালন, নিড়ানি, শাকসব্জী চাষ, জ্বালানি সংগ্রহ ও তা বিক্রয় করা সহ নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই বাস্তুচ্যুত মানুষগুলো অত্যন্ত দুঃখ, কষ্ট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সঙ্গী করে সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে মসজিদে কাটিয়ে দেন তিন বছর, কোনরূপ সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই। তারা তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে অনেক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তবে তা কখনো ফলপ্রসু হয়নি। এই পরিবারগুলোর জীবনে পরিবর্তন আসে ১৯৭৭ সাল নাগাদ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট রাজ্যে সরকার গঠন করলে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর কাছে তা আশীর্বাদ হয়ে আসে। এই বছরেই স্থানীয় বামপন্থী নেত্রী বর্গের উদ্যোগে মসজিদে বসবাসকারী ১৪ টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রহমতপুর অঞ্চলের মাঝামাঝি স্থানে সরকারি পরিত্যক্ত নিম্ন সমতল ভূমিকে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দখলদারি থেকে উদ্ধার করে উদ্বাস্তু পরিবার গুলোকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা

হয়। বামপন্থী নেতাদের সহযোগিতায় মসজিদে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষগুলো রাতারাতি বাঁশ, কাঠ, পাটকাঠি, টিন, মাটি দিয়ে বসতি গড়ে তোলে। দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত বাম নেতা উপানন্দ বিশ্বাসের নাম অনুসারে কলোনির নামকরণ করা হয় 'উপানন্দ কলোনি'। কলোনি স্থাপনে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মঙ্গল বিশ্বাস, সত্যেন মন্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান সমর সরকার, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস সহ প্রমুখেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৮ সালে রহমত পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসলে উদ্বাস্ত পরিবার গুলোর জীবন জীবিকার সমস্যা কিছুটা সমাধান ঘটে। সরকারের 'Food for work scheme' এর অধীনে উদ্বান্ত পরিবারগুলোকে কাজের বিনিময়ে গম, চাল, মাইলো সহ অন্যান্য খাদ্য শষ্য প্রদান করে। ১৯৭৯ সালে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কলোনির বাসিন্দাদের মাটির দেওয়াল সহ টালির চালের ঘর নির্মাণ, ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড করে দেওয়া হয়।

কলোনিবাসীরা সম্পূর্ণরূপে বসতি স্থাপন গড়ে তোলার আগেই ১৯৭৮ সালের শেষ নাগাদ বন্যায় কলোনিটি ডুবে যায়। বন্যার কারণে কলোনিবাসীরা আবারও বাস্তুচ্যুত হয় ও স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নেয়। স্থানীয়দের সহযোগিতা আবার কখনো অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েও তারা না দমে পুনঃরায় সেই স্থানে বসতি গড়ে তোলে। কলোনির বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রায় এক কিমি কাঁদা জলাভূমি পথ অতিক্রম করতে হত। যার ফলে কলোনির বাচ্চারা স্কুলে আসার সময় সাধারণ জামাকাপড় পরে স্কুলে এসে, স্কুল সংলগ্ন স্থানীয়দের বাড়িতে তা পরিবর্তন করে স্কুলে যেত। কলোনিতে প্রবেশের একমাত্র পথ ছিল পায়ে হাঁটা অন্যথায় কোনভাবেই প্রবেশ করা যেত না, তাই তারা কলোনি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার আগে স্থানীয়দের বাড়িতে সাইকেল, রিক্সা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রেখে আসতে বাধ্য হত। ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই চিত্র লক্ষ্য করা যেত তবে ওই বছরের শেষের দিকে রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জলাভূমির মধ্য দিয়ে বাঁধ দিয়ে করে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। ১৪ টি পরিবার নিয়ে উপানন্দ কলোনি গড়ে উঠলেও বর্তমানে কলোনিতে ৪০ টি পরিবার ও ১৭৩ জন মানুষের বসবাস। কলোনির প্রায় ৮৯ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত এবং ৬ শতাংশ মানুষ দেশে বিদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত এবং ৫ শতাংশ মানুষ তাঁত শিল্প, চাকুরী, পরিবহন সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল কলোনিবাসীদের কলোনি পরিত্যাগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

**তারক কলোনি:**

১৯৬৮ সাল ও তার পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রায় ত্রিশটি শরণার্থী পরিবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী নদীর চর সংলগ্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তবে সেখানেও ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নদীর ভাঙ্গনের কারণে ভাগ্যের পরিহাসে তাদের পুনরায় বাস্তুচ্যুত হতে হয়। ১৯৮৬ সালে এই ৩০ টি শরণার্থী পরিবার করিমপুর থানার অন্তর্গত রহমতপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পূর্বে গড়ে ওঠা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলোনির বাসিন্দা ও স্থানীয়দের সহায়তায় এই শরণার্থী পরিবারগুলো স্বল্পমূল্যে জমি ক্রয় করে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। কলোনিটি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়নি, এক্ষেত্রে তারা স্থানীয়দের সহযোগিতা পায়। কলোনিতে তেমন রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলেও কলোনির নামকরণ হয় প্রয়াত বামপন্থী নেতা তারক বিশ্বাসের নাম অনুসারে 'তারক কলোনি'। যেহেতু উদ্বান্তরা নিজেদের উদ্যোগে জমি ক্রয় করে কলোনিটি গড়ে তোলে তাই কলোনি স্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি অন্যান্য কলোনির মতো। তারক কলোনি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তরা সরাসরি স্থানীয় বিত্তশালী ধনী কৃষকদের কাছে থেকে জমি ক্রয় করে। বিশ শতকের যাট থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত স্থানীয় মানুষের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল ডাকাতি ও লুটপাটের সমস্যা। যার ফলে কলোনিটি গড়ে ওঠায় লুটপাট ও ডাকাতির ঘটনা অনেকটাই কমে। কারণ স্থানীয়দের স্বল্পমূল্যে বিক্রিত যে জমিগুলোতে উদ্বাস্তরা বসতি স্থাপন করেছিল,

সেই জমিগুলো ছিল মূল গ্রামের বাইরের দিকে অবস্থিত করিমপুর ও কৃষ্ণনগর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ফাঁকা মাঠে। যে স্থানগুলো ডাকাতরা যাতায়াতের রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করত সেই এলাকাগুলোতে তারা বসতি গড়ে তোলে। তৎকালীন সময়ে বর্ডারে কোন কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় বর্ডার সংলগ্ন এই অঞ্চল গুলোতে বাংলাদেশি ডাকাতদের ব্যাপক উপদ্রব ছিল। প্রায় প্রতিদিন ডাকাতির ঘটনা ঘটত। পরবর্তী সময়ে কিছু উদ্বাস্তু পরিবার জীবন জীবিকার উদ্দেশ্যে ও ডাকাতির উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে অন্যত্র চলে যায়, আবার কিছু পরিবার নতুন করে কলোনিতে বসতি গড়ে তোলে। বর্তমানে কলোনিটিতে ৬৫টি পরিবার ও ৩৩০ জন মানুষ বসবাস করে। কলোনির প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ, ৫ শতাংশ মানুষ দেশে-বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত এবং ৫ শতাংশ মানুষ তাঁত শিল্প, পরিবহন ব্যবস্থা, চাকুরী সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত।

তারক কলোনির বাসিন্দাদের দুবার উদ্বাস্তু হতে হয় প্রথমবার দেশ ভাগকে কেন্দ্র করে ও দ্বিতীয় বার জলঙ্গি নদীর চর সংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নদীর ভাঙ্গনের কারণে। তবে তারা অন্যান্য কলোনির বাসিন্দাদের মত বসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। দ্বিতীয়বারও তারা জমি ক্রয় করে নিজেদের উদ্যোগে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে, সেই পরিস্থিতিতে তাদের প্রধান সমস্যা ছিল ছিল জীবিকা। কারণ ইতিপূর্বে তারা নদী, খাল, বিল কে কেন্দ্র করে নিজেদের অর্থনীতি পরিচালনা করে আসছিল। রহমতপুর অঞ্চলে এসে তারা জলকেন্দ্রিক অর্থনীতি থেকে দূরে চলে আসে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অংশ হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়কালে তারা ভাগ চাষ, জমি লিজ নেওয়া, জমি ক্রয় করে চাষবাস শুরু করে। নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে তারা স্বল্প মূল্যে জমি ক্রয় করে আমন ধান, পাট, রসুন, পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন শাকসব্জি চাষ শুরু করে। রসুন, পেঁয়াজ ও অন্যান্য বিভিন্ন সব্জি যা সাধারণত স্থানীয় কৃষকেরা পূর্বে চাষ করত না। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের হাত ধরে এই অঞ্চলগুলিতে এক নতুন ধারার চাষবাসের সূত্রপাত ঘটে। বর্তমান সময়ে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার প্রায় ১০ থেকে ১৩ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক এবং তারা সকলেই স্বচ্ছলতার সঙ্গে জীবন যাপন করছে।

**প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি:**

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুতো হয়ে বিভিন্ন সময় অসংখ্য উদ্বাস্তু নানান স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে যাযাবরের মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। ১৯৮৪ সালে করিমপুর থানার গোয়াস অঞ্চলে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় ৪৮ টি উদ্বাস্তু পরিবার বসতি গড়ে তোলে এবং প্রথম পর্যায়ে তারা মুর্শিদাবাদের উদয়নগর কলোনিতে বসতি স্থাপন করলেও সেখানে ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নদীর ভাঙ্গনের কারণে গোয়াস দক্ষিণপাড়া অঞ্চলে চলে আসে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। বাস্তুচ্যুত মানুষ গুলোর পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন গ্রাম পঞ্চায়েতের বামপন্থী নেতা কেশব চন্দ্র বিশ্বাস ও উপপ্রধান মনমোহন সরকার। এই ছিন্নমূল মানুষ গুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় বাসিন্দা প্রয়াত নিপেন পালের ২২ বিঘা জমিতে। নিপেন পাল উত্তরাধিকারহীন হওয়ায় তাঁর পরিত্যক্ত জমিতে স্থানীয় সিপিআইএম নেতাদের সহায়তায় কলোনিটি গড়ে ওঠে। সিপিআইএমের প্রয়াত প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের নাম অনুসারে কলোনির নামকরণ করা হয় ‘প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি বা PDG কলোনি’।

প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যা দেখা যায় প্রয়াত নিপেন পালের দূর সম্পর্কের ভাইপো মানব পালের কাছে থেকে। তবে সেক্ষেত্রে মানব পালের জমির উপর কোন বৈধ উত্তরাধিকার ও কাগজপত্র না থাকাই তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়েই কলোনি স্থাপন মেনে নেন। বামপন্থী সিপিআইএম নেতা কেশবচন্দ্র বিশ্বাস, ভক্তগোপাল মণ্ডল, অনিল বিশ্বাস, বাবর আলী মন্ডল, জুরান বিশ্বাস, পঞ্চায়েত প্রধান শংকর বিশ্বাস, ও করিমপুর বিধানসভার বিধায়ক চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের উদ্যোগে কলোনির বাসিন্দাদের সিপিআইএমের

সদস্যপদ দেওয়া হয় ও কলোনিতে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদের সিপিআইএম সদস্য প্রফুল্ল কুমার ভৌমিকের নেতৃত্বে গোয়াস অঞ্চলের স্থানীয় সিপিআইএম নেতা সিরাজ আলী মন্ডল, গফুর মন্ডল, গফুর বিশ্বাস সহ অন্যান্যদের উদ্যোগে কলোনি উচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে কলোনিবাসীদের অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রফুল্ল কুমার ভৌমিকের নেতৃত্বে কলোনিতে সভা করে উল্লেখ করা হয় কলোনি গড়ে ওঠার পিছনে সিপিআইএম পার্টির কোন সমর্থন নেই, তাই কলোনিতে উত্তোলিত সিপিআইএম এর পতাকা খুলে ফেলারও তিনি নির্দেশ দেন। স্থানীয় সিপিআইএম নেতা জুরান বিশ্বাস ও অন্যান্যদের বিরোধিতায় উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে জেলা পরিষদের সদস্য প্রফুল্ল কুমার ভৌমিক নিজ প্রভাব খাটিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কলোনি উচ্ছেদের নানান প্রচেষ্টা করেন। পুলিশকে কাজে লাগিয়ে কলোনিবাসীদের গ্রেপ্তার করা, ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া সহ নানান পন্থা অবলম্বন করে ও কলোনিবাসীদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। রাত্রে ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে কলোনিবাসীরা সজাগ থাকার জানান দেয়, তাদের ঘরবাড়ি ভাঙতে আসা পুলিশ বাহিনীকে। তবে পুলিশ প্রশাসনও চাপে পড়ে এক প্রকার বাধ্য হয়েই এই কাজ করতো। তৎকালীন করিমপুর থানার আইসি রনজিৎ বিশ্বাস কলোনিবাসীদের প্রতি ছিলেন সহৃদয়। তিনি প্রশাসনিক বিভিন্ন খবরা খবর প্রধানত কলোনির উপর পুলিশি অভিযানের খবরা খবর দিয়ে কলোনিবাসীকে সচেতন করে দিতেন। করিমপুর বিধানসভার বিধায়ক, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও পুলিশ প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে প্রফুল্ল ভৌমিকের পক্ষে কলোনি উচ্ছেদ করা আর সম্ভব হয়নি।

১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে (বাং ১৪০০ সালের চৈত্র মাস) সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি, আনন্দনগর কলোনি, প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনির মতুয়া সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা ডংকা, কাসর বাজিয়ে হরিবোল নাম সংকীর্তন করে প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনির পার্শ্ববর্তী গোয়াস দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে বেতায়ে শিবরাত্রি পালনে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। দাঙ্গার কারণে প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটালে সম্পূর্ণ কলোনি পুড়ে যায় (৪৮ টি বাড়ি)। দাঙ্গা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপক আকার ধারণ করে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গায় প্রথম দিকে প্রচুর কলোনিবাসী গুরুতরও আহত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অল্প সময়ের মধ্যে পার্শ্ববর্তী নন্দনপুর ক্যাম্প থেকে বিএসএফ আসে। কলোনি বাসীদের বিবরণ অনুযায়ী দ্বিতীয় পর্যায়ে উভয় পক্ষের মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হলেও মুসলিম পক্ষের কিছু মানুষ নিহত হয়, যারা বেশিরভাগই ছিল পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা। দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে প্রচুর কলোনিবাসীর গ্রেপ্তার ও হাজতবাস হয়। বর্তমানে কলোনিতে ১৮৫ টি পরিবার ও প্রায় ৮০০ জনেরও বেশি মানুষ বসবাস করে কলোনি শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ, ৩ শতাংশ মানুষ চাকুরীজীবী, ৩ শতাংশ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক ও ৪ শতাংশ তাঁত শিল্প পরিবহন সহ অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনির বাসিন্দারা বর্তমানে দুটি ভাগে বিভক্ত। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত উদ্বাস্তুদের নিয়ে গঠিত একটি অংশ অপরটি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল স্বল্পশিক্ষিত ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে গঠিত অংশ। কলোনির সমৃদ্ধ শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী উদ্বাস্তুরা বর্তমানে নিজেদের কলোনির বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করে ও নিজেদের অন্য পরিচয় দেন। এইরূপ ৪৪ টি পরিবার আছে যাদের প্রায় ১৮০ জন মানুষের মধ্যে ২২ জন সরকারি চাকরি ও প্রায় ১০ জন ব্যবসা-বাণিজ্য সহ অন্যান্যরা স্বচ্ছল কৃষক। অপরদিকে দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমজীবী, কম শিক্ষিত, দরিদ্র মানুষগুলো নিজেদের কলোনিবাসী ও উদ্বাস্তু হিসেবেই পরিচয় দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে করিমপুর ও মহিষবাথান অঞ্চলে বেশ কিছু অস্থায়ী কলোনি গড়ে ওঠে। কলোনি গুলো প্রধানত সরকারি সহযোগিতায় গড়ে ওঠে। এই অস্থায়ী কলোনিগুলির বাসিন্দারা ছিল প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা পাক সরকার বিরোধী মুজিবপন্থী হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধে

জয়লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই তারা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে। আবার অনেক উদ্বাস্তু পরিবার করিমপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস শুরু করে। শিশা গ্রামে প্রায় পাঁচটি হিন্দু পরিবার ও মালিয়ানতলা গ্রামে বেশ কিছু মুসলিম পরিবার স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এছাড়া বর্তমান সময়েও করিমপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ডার দিয়ে অবৈধভাবে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীদের আগমন ঘটছে। নদিয়া জেলার ২৬৯ কিমি সীমারেখা পূর্ববঙ্গ বা স্বাধীন বাংলাদেশের সীমানা স্পর্শ করে আছে। এই ২৬৯ কিমি সীমারেখার মধ্যে রয়েছে সাতটি ব্লক যেগুলি উদ্বাস্তুদের প্রবেশ ও বসবাসের প্রধান অঞ্চল। করিমপুরে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা ছিল ব্যাপক ও বৃহৎ। ১৯৭১ সালে করিমপুরে ভোটার সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার ২৯০ জন এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩৯৩ জন।[১৩] মাত্র কুড়ি বছরে করিমপুরের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৬৭ হাজার ১০৩ জন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে এইরূপ অস্বাভাবিক ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হলো উদ্বাস্তুদের আগমন।

**উপসংহার:**

দেশভাগ, উদ্ধাস্তু সমস্যা ও ১৯৭১ সাল পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু আগমনের ঘটনা আধুনিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিন্নমূল কলোনিবাসীদের ভাষা, খাবার দাবার, ধর্মীয় রীতিনীতি সবকিছুই ছিল স্থানীয় মানুষদের থেকে ভিন্ন। যার ফলে তাদের ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয়দের সংস্কৃতির মিলনে করিমপুর অঞ্চলে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়, যা এই অঞ্চলে সর্বত্রই কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে কলোনিগুলোর বর্তমান প্রজন্ম নিজেদের কলোনিবাসী বা উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করে। তাদের অনেকেই নিজেদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, ভাষা, খাদ্যাভাস সহ নানান ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে।[৯] আবার অনেকে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে গর্বের সঙ্গে বহন করছে। এরা 'হাতে কাম মুখে নাম' এই মন্ত্র নিয়ে গর্বের সঙ্গে কলোনিতে বসবাস করছে।[১০] তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় কলোনিবাসী মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষগুলো আজও তেমন কোনো সরকারি সহযোগিতা পাননি। তারা শুধুমাত্র ভোটের উৎস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে গেছে প্রথমে সিপিআইএমের ও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দল গুলোর। এসবের সত্বেও এই ছিন্নমূল কলোনিবাসী মানুষগুলো কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সাফল্যের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

**তথ্যসূত্র:**

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়। উদ্বাস্তু। দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২৩৯।
২. বিশ্বাস, সুভাষ। দেশভাগ ও বাঙালি বাস্তহারা। দিশা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৪১।
৩. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার। প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনেরকথা। দীপ প্রকাশন, কলকাতা ২০২১, পৃ. ৬৮।
৪. ধংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ। সেরিবান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়। উদ্বাস্তু। দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২৪২।
৬. ধংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ। সেরিবান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩।
৭. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার। প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনেরকথা। দীপ প্রকাশন, কলকাতা ২০২১, পৃ. ২১১।
৮. https://resultuniversity.com/election/karimpur-West-bengal-assembly-constituency .
৯. ধংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ। সেরিবান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৬।
১০. বিশ্বাস, সুভাষ। দেশভাগ ও বাঙালি বাস্তহারা। দিশা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৩৭।

**সাক্ষাৎকার:**

১. সরকার, মনমোহন। উদ্বাস্তু নাগরিক, প্রাক্তন উপপ্রধান, উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা, সাংবাদিক, নাট্যকার, ০৬/০৯/২০২২।

২. মন্ডল, মঙ্গলচন্দ্র। বয়স্ক নাগরিক, সিপিআইএম নেতা, রহমতপুর সমবায় সমিতির সভাপতি ১০/১০/২০২২।

৩. টিকাদার, কানাইলাল। বয়স্ক নাগরিক, কলোনীর বাসিন্দা ১১/১০/২০২২।

৪. সরকার, কার্তিকচন্দ্র। সমাজকর্মী, পঞ্চায়েত সদস্য, অনির্বাণ ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক, কলোনির বাসিন্দা, ১৩/১০ ২০২২।

৫. বিশ্বাস, সুধীর। বয়স্ক উদ্বাস্তু নাগরিক, ৩১/১০/২০২২।

৬. সরকার, বাসুদেব। বয়স্ক উদ্বাস্তু নাগরিক, প্রাক্তন শিক্ষক, ৩১/১০/২০২২।